অলৌকিক

কর্তার সিং দুগ্‌গাল

‘তারপর গুরু নানক ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছোলেন হাসান আব্দালের জঙ্গলে। ভয়ানক গরম পড়েছে। গনগনে রোদ। চারিদিক সুনসান। পাথরের চাঁই, ধু ধু বালি, ঝলসে যাওয়া শুকনো গাছপালা। কোথাও একটা জনমানুষ নেই।’

‘তারপর কী হল মা?’ আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

‘গুরু নানক আত্মমগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ শিষ্য মর্দানার জল তেষ্টা পেল। কিন্তু কোথায় জল? গুরু বললেন, ভাই মর্দানা, সবুর করো। পরের গাঁয়ে গেলেই পাবে।’ কিন্তু তার কাকুতি-মিনতি শুনে গুরু নানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অনেক দূর পর্যন্ত জল পাওয়া যাবে না, অথচ সে বেঁকে বসলে সবাইকেই ঝক্কি পোয়াতে হবে। গুরু বোঝানোর চেষ্টা করলেন, ‘দ্যাখো মর্দানা, কোথাও জল নেই, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো। এটাকে ভগবানের অভিপ্রায় বলেই মেনে নাও।’ মর্দানা তবু নড়তে রাজি নয়। সেখানেই বসে পড়ে। এগুবার আর উপায় নেই। গুরু গভীর সমস্যায় পড়লেন। মর্দানার একগুঁয়েমি দেখে হাসি পেলেও সেই সঙ্গে বিরক্তও হলেন। পরিস্থিতি দেখে ধ্যানে বসলেন তিনি। চোখ খুলে দেখেন, মর্দানা তেষ্টার চোটে জল ছাড়া মাছের মতো ছটফট করছে। সদ্‌গুরু তখন ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ‘ভাই মর্দানা, এখানে পাহাড়ের চুড়োয় বলী কান্ধারী নামে এক দরবেশ কুটির বেঁধে থাকেন। ওঁর কাছে জল পেতে পার। এ তল্লাটে ওঁর কুয়ো ছাড়া আর কোথাও জল নেই।’

'তারপর কী হল মা?' মর্দানা জল পেল কিনা জানবার আর তর সইছিল না।

'মর্দানা শুনেই ছুটে গেল। একে তেষ্টায় কাতর, তার উপর মাথায় গনগনে রোদ। ঘেমে নেয়ে পাহাড়ে উঠছে। হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ অবধি অনেক কষ্টে উঠতে পারল। বলী কান্ধারীকে সেলাম জানিয়ে জল চাইলে তিনি কুয়োর দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে কুয়োর দিকে এগুলে হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে। জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে আসছ? মর্দানা জানায়, আমি পির নানকের সঙ্গী। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু নীচে কোথাও জল নেই।' নানকের নাম কানে যেতেই বলী রেগে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিলেন। নেমে সে নালিশ জানাল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গুরু হাসেন, 'মর্দানা তুমি আর একবার যাও। এবার নম্রভাবে বলবে, আমি নানক দরবেশের অনুচর'। তার ভয়ংকর তেষ্টা পেয়েছে, অন্য কোথাও জল নেই। ক্ষোভে দুঃখে বিড়বিড় করতে করতে সে আবার গেল। কিন্তু বলী কান্ধারী 'আমি কাফেরের শিষ্যকে এক গণ্ডুষ জলও দেব না' বলে এবারও তাড়িয়ে দিলেন। মর্দানা এবার যখন ফিরল, তখন রীতিমতো করুণ অবস্থা। গলা শুকিয়ে ফেটে যাচ্ছে, দরদর করে ঘামছে। বেশিক্ষণ বাঁচাবে কি না সন্দেহ। গুরু নানাক সব শুনে মর্দানাকে 'জয় নিরঙ্কার' বলে ওঁর কাছে আর একবার যেতে বললেন। আদেশ অমান্য করতে না পেরে সে ফের রওনা দিল। যা অবস্থা, হয়তো পথেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। তিন বারের বার চুড়োয় পৌঁছেই মর্দানা ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ ফকির এবারও কাকুতিমিনতি অগ্রাহ্য করলেন, 'ওই নানক নিজেকে পির বলে জাহির করে অথচ চেলার জন্য সামান্য খাবার জলও জোগাড় করতে পারে না।' বলী কান্ধারী যথেচ্ছ গালাগাল করলেন। মর্দানা নেমে এসে গুরু নানকের পায়ে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল। পিঠে হাত বুলিয়ে, সাহস জুগিয়ে উনি তাকে সামনের পাথরটা তুলতে বলেন। পাথরটা তোলায় তলা থেকে জলের ঝরণা বেরিয়ে এল। নিমেষেই চারিদিকে থৈ থৈ। ঠিক সেই সময় বলী কান্ধারীর জলের দরকার হয়েছে। দেখেন, কুয়োয় একটুও জল নেই। উনি রীতিমত হতভম্ব। ওদিকে নীচে জলস্রোত দেখা দিয়েছে। বলী কান্ধারী দেখলেন, গুরু নানক দূরে বাবলাতলে অনুচরসহ বসে রয়েছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে বলী পাথরের একখানা চাঙড় নীচে গড়িয়ে দেন। দৃশ্যটা দেখে মর্দানা চেঁচিয়ে উঠতেই গুরু নানক শান্ত স্বরে 'জয় নিরঙ্কার' ধ্বনি দিতে বলেন। কাছে আসতেই উনি হাত দিয়ে পাথরটা থামিয়ে দিলেন। হাসান আব্দালে এখন যার নাম 'পাঞ্জা সাহেব', গুরু নানকের হাতের ছাপ ওতে আজও লেগে রয়েছে।

গল্পটা শুনতে বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু হাত দিয়ে পাথরের চাঙড় থামিয়ে দেবার ব্যাপারটা মেজাজ বিগড়ে দিল। এ কি আদৌ সম্ভব? একটা মানুষ কীভাবে পাথরের চাঙড় থামিয়ে দেবে? ওতে কিনা আজো হাতের ছাপ লেগে আছে! বিশ্বাস হল না, 'মনে হয় পরে কেউ খোদাই করেছে', মা-র সঙ্গে তর্ক শুরু করি। পাথরের তলা থেকে জল বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলের উৎস আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙড় হাত দিয়ে থামিয়ে দেওয়া কিছুতেই বিশ্বাস হল না। মুখের ভঙ্গিতে মনের ভাবটা ফুটে ওঠায় মা চুপ করে গেলেন।

'গড়িয়ে পড়া পাথর কীভাবে থামবে?' গল্পটা মনে পড়লেই হাসি পেত।

গল্পটা বার কয়েক গুরুদ্বারেতেও শুনেছি। কিন্তু এই ব্যাপারটাতে সবসময়েই মাথা বাঁকিয়েছি। এটা অসম্ভব।

গল্পটা আমাদের স্কুলে শোনানো হল। পাথরের ব্যাপারটা নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গেও তর্ক করলাম। 'যারা পারে তাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব না' বলে উনি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন।

তবু বিশ্বাস হল না। পাথরের চাঙড় কেউ থামাতে পারে? আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করত।

কিছুদিন পর শুনলাম, পাঞ্জাসাহেবে 'সাকা' হয়েছে। সেকালে ঘনঘন 'সাকা' হত। কোথাও সাকা হলেই বুঝতে পারতাম, বাড়িতে অরন্ধন। রাতে মেঝেতে শুতে হবে। তবে সাকা আসলে কী, তখন জানতাম না।

আমাদের গাঁ থেকে পাঞ্জাসাহেব তেমন দূরে না। সাকার খবর পাওয়া মাত্র মা পাঞ্জাসাহেবের দিকে রওনা দিল। সঙ্গে আমি আর আমার ছোটোবোন। সারাটা পথ ধরে মা কেঁদেছিল। সাকার ব্যাপারটা কী, সারাক্ষণ ধরে তাই ভাবছি। পাঞ্জাসাহেবে পৌঁছে এক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানতে পারি।

দূরের শহরের ফিরিঙ্গিরা নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর গুলি করেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আছে মৃতদের মধ্যে। বাকিদের অন্য শহরের জেলে পাঠানো হচ্ছে। কয়েদিদের যদিও খিদে-তেষ্টায় সব মরার মতো অবস্থা, তাও হুকুম হয়েছে, তাদের ট্রেন যেন কোথাও না থামে। পাঞ্জা সাহেবের লোকজন খবরটা পেয়ে সবাই উত্তেজিত।

পাঞ্জা সাহেবেই গুরু নানক মর্দানার তেষ্টা মিটিয়েছিলেন। সেই শহর দিয়ে খিদে-তেষ্টায় কাতর কয়েদিদের ট্রেন যাবে এ হতে পারে না! ঠিক হল, ট্রেনটা থামানো হবে। স্টেশনমাস্টারের কাছে আবেদন জানানো হল। টেলিফোন, টেলিগ্রাম গেল। তবু ফিরিঙ্গিদের হুকুম, কিছুতেই ট্রেনটাকে থামানো যাবে না। এদিকে ট্রেনের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমিকেরা খিদেয় কাতর। জল, রুটির ব্যবস্থা নেই। সেখানে ট্রেন থামানোর কোনো ব্যবস্থা হয়নি। তবু লোকজন ট্রেন থামাতে বদ্ধপরিকর। শহরবাসীরা তাই স্টেশনে রুটি, পায়েস, লুচি-ডাল ডাঁই করে রাখে।

কিন্তু ট্রেনটা ঝড়ের বেগে স্টেশন পেরিয়ে যাবে। কী করা যায়?

মায়ের বান্ধবী আমাদের সমস্ত ঘটনাটা শোনালেন, 'রেললাইনে আমার ছেলেপুলের বাবা ও তারপর ওঁর সঙ্গীরা শুয়ে পড়লেন। ওঁদের পেছনে এক-একজন করে আমরা বউ ও বাচ্চারা। তীক্ষ্ণ হুইসেল দিতে দিতে ট্রেন এল। গতি আগেই কমিয়েছে কিন্তু থামল অনেক দূরে এসে। দেখি ওর বুকের উপর দিয়ে চাকা, তারপর ওঁর সঙ্গীদের বুকের উপর দিয়ে আমি চোখ বুঁজলাম। চোখ খুলে দেখি ট্রেনটা একেবারে আমার মাথার কাছে এসে থেমেছে। পাশে শুয়ে থাকা সকলের বুক থেকে জয় নিরঙ্কার ধ্বনি বেরুচ্ছে। ট্রেনটা পিছোতে লাগল, লাশগুলো কেটে দুমড়ে মুচড়ে গেল। স্বচক্ষে দেখেছি, খালপারের সেতুটির দিকে রক্তের স্রোত।

অবাক-বিহ্বল বসে আছি, মুখে কথা নেই। সারাদিন একফোঁটা জলও মুখে দিতে পারিনি।

সন্ধ্যায় ফেরার পথে মা ছোটোবোনকে পাঞ্জাসাহেবের গল্প বলছিল। গুরু নানক মর্দানার সঙ্গে কীভাবে এ রাস্তায় এসেছিলেন। তেষ্টা পেলে গুরু নানক কোন পরিস্থিতিতে তাকে বলী কান্ধারীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বলী কান্ধারী কীভাবে তিন-তিনবার মর্দানাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গুরু নানক তাকে কখন পাথর তুলতে বলেন। কীভাবে মাটি ফুঁড়ে ঝরনা বেরিয়ে আসে। তাতে বলী কান্ধারী ক্ষিপ্ত হয়ে পাথরের বড়ো চাঙড় গড়িয়ে দেয়। মর্দানা ঘাবড়ে গেলেও গুরু নানক 'জয় নিরঙ্কার' বলে কীভাবে হাত দিয়ে সেটা থামিয়ে দেন। শুনতে-শুনতে ছোটোবোন মাকে বাধা দিল, 'কিন্তু একটা মানুষ কীভাবে পাথরের এত বড়ো একটা চাঙড় থামাবে?' অমনি আমি বলে উঠি, 'ঝড়ের বেগে ছুটে আসা ট্রেন থামানো গেল, পাথরের চাঁই থামানো যাবে না কেন?' আমার চোখে জল। কোনো কিছুর পরোয়া না করে, জীবন তুচ্ছ করে ট্রেন থামিয়ে যারা খিদে তেষ্টায় কাতর দেশবাসীকে রুটিজল পৌঁছে দিয়েছিল, চোখের জলটা তাদের জন্য।

ভাষান্তর : অনিন্দ্য সৌরভ